Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.132-140
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ঠান্ডাযুদ্ধের পরবর্তীকালে দক্ষিণের দেশগুলোতে উত্তরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার বহুমুখী কার্যকলাপ: সমসাময়িক বিশ্বব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশ্লেষণধর্মী অধ্যয়ন

সৌমেন ভট্টাচার্য
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Southern countries have been backward in social, economic, political and cultural aspects due to being under colonial rule for a long time. After gaining independence, efforts to establish hegemony in new strategies under the umbrella of globalization can be seen in southern countries. Imitation of the European model of development was once seen as the wrong policy in the countries of the South. Northern states created demand for consumer goods in the South mainly to establish hegemony. A one-way hegemonic structure of dependency has been developed to establish hegemony in the countries of the South. Overpopulation pressure has also contributed to increased dependency. The stable infrastructure of the United Nations has had a negative impact on the countries of the South. The international media has played a significant role in establishing the hegemony of the Northern countries. These hegemonic states continue to exert influence over government power under new pretexts in the underdeveloped and developing countries of the third world. The liberal attitude and over-consumerism of the citizens of the South Asian countries created an opportunity for the dominant countries to establish dominance. The colonial model that South Asian countries have followed for their development has presented new challenges to South Asian countries. China's rise as a new power in Asia has caused concern in both South Asia and Europe. The permanent membership of the Security Council, the most important body of the United Nations, has remained the same since 1945 for the hegemonic powers to retain power. This passive attitude of the United Nations Security Council has greatly enhanced US hegemony in South Asia. Looking back to 1919, it can be seen that about 70% of the world population was under colonial rule at that time and most of the countries in South Asia were under British, French rule at that time. Gradually in 1966 AD the picture of this situation changed a lot and at this time it was observed that only 1% of the population was tied to subjugation. We will review from various aspects how the countries of South Asia are being exploited by the dominant countries of Europe and America from various aspects.

Keywords: নতুন কৌশলে আধিপত্যবাদ, ভোগ্য পণ্যের প্রতি চাহিদাবৃদ্ধি, একমুখী আধিপত্যকারী কাঠামো, জাতিপুঞ্জের স্থিতিশীল ভূমিকা, আন্তর্জাতিক মিডিয়া।

ভূমিকা: দক্ষিণের যে সমস্ত দেশগুলি আজ আন্তর্জাতিক বিশ্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে তারমধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল সার্কভুক্ত আটটি রাষ্ট্র যথা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ও আফগানিস্তান। এই সমস্ত দেশগুলি জন্মলগ্ন থেকেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শোষণের শিকার। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশগুলি দীর্ঘদিন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক সবদিক থেকেই ভীষণভাবে শোষিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনে থাকার পর ক্রমে পরাধীনতার বেড়াজাল অতিক্রম করে দক্ষিণের দেশগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভ করার পরও এই সমস্ত দেশ গুলো গণতন্ত্রের আধিপত্যকারী শোষণের বেড়াজাল থেকে এখনো পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি। বিশ্বায়নের ছত্রছায়ায় এই দেশগুলি নতুন নতুন কৌশলে ইউরোপীয় আধিপত্যবাদের শিকার হয়। এই সমস্ত দেশগুলো থেকে উপনিবেশবাদের অবসান ঘটলেও নতুন করে বিভিন্ন কৌশলে এই সমস্ত দেশগুলির উপর আধিপত্যবাদ প্রভাব বিস্তার করে, যা নয়া-উপনিবেশবাদ নামে পরিচিত। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল এই সমস্ত দেশগুলিতে নতুন নতুন অজুহাতে সরকারি ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে উত্তরের আধিপত্যকারী রাষ্ট্রগুলি। সাম্রাজ্য বিস্তারের নতুন নতুন কৌশল কেন্দ্রীয় এলাকার রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি আধা প্রান্তবর্তী এবং প্রান্তীয় এলাকার রাষ্ট্রগুলোর উপর বিশেষত দক্ষিণের দেশগুলির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। দক্ষিণের দেশগুলোর উদার মনোভাব এবং অতিরিক্ত ভোগবাদী মানসিকতা আধিপত্যকারী উত্তরের দেশগুলোর কাছে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো তাদের বিকাশের জন্য যে উপনিবেশিক মডেল অনুকরণ করেছে তা দক্ষিণের দেশগুলোকে নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। এশিয়ার নতুন শক্তি হিসেবে চীনের উত্থান দক্ষিণের দেশগুলো এবং উত্তরের দেশগুলো উভয়ের কাছেই উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। চীনের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, নেপাল, ভুটান, ভারত, বাংলাদেশের কাছে এশিয়ার শান্তি বজায় রাখা কঠিন করে তুলেছে। চীনের শক্তি প্রদর্শন ভারতকে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ে নতুন করে উৎসাহ যুগিয়েছে। চীনের উহান থেকে উৎপত্তি হওয়া করোনা ভাইরাস দক্ষিণের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে এবং এই সমস্ত দেশের উন্নয়ন অনেকটাই স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওমিক্রণ পর্যায়ে আফগানিস্তানের মতো দেশে লক্ষ্য করা গেছে তীব্র খাদ্য সংকট। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালিবানের পুনরুত্থান দক্ষিণের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশের উপর নতুন চাপ সৃষ্টি করেছে। আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার সেনা প্রত্যাহারের পিছনে মার্কিন সরকারের যে দুরভিসন্ধি কাজ করেছে তা নিয়ে অনেকেই মতামত ব্যক্ত করেছেন। আধিপত্যকারী উত্তরের দেশগুলি ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যকে ১৯৪৫ সালের পর থেকে একই রকম রেখে দিয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের এই নিষ্ক্রিয় মনোভাবের জন্য দক্ষিণের উপর মার্কিন আধিপত্যবাদ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ এবং ওমিক্রন পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো আধিপত্যশীল দেশগুলিতে শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করতে যাওয়া অনেক শ্রমিককে কাজ হারাতে হয়েছে এবং তারা কর্মহীন হয়ে দক্ষিণে দেশগুলিতে ফিরে এসেছে এবং সরকারের উপর নতূন করে চাপ বৃদ্ধি করেছে। ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের শ্রমিকদের একটা বড় অংশ তুলনামূলকভাবে অনেক কম মজুরিতে কাজ করে উত্তরের দেশগুলিতে। বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করে দেখব কিভাবে দক্ষিণ

এশিয়ার দেশগুলো বিভিন্ন দিক থেকে উত্তরের বিশেষত ইউরোপ ও আমেরিকার আধিপত্যশীল দেশগুলোর কাছে শোষণের শিকার হচ্ছে।

প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন: ১৯১৯ সালের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ৭০% সেই সময়ে পরাধীন ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে এবং দক্ষিণের বেশিরভাগ দেশই এই সময় ব্রিটিশ, ফরাসিদের অধীনে ছিল। ক্রমে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই অবস্থার চিত্র অনেকটা পাল্টে যায় এবং এই সময়ে লক্ষ্য করা যায় মাত্র ১% জনসংখ্যা পরাধীনতায় আবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লক্ষ্য করলে দেখা যায় দেশগুলি রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতা লাভ করলেও ক্রমশই অর্থনৈতিক দিক থেকে দক্ষিণের দেশগুলি পূর্বতন উত্তরের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর উপর আরো বেশী নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। আধিপত্যকারী শিল্পোন্নত উত্তরের দেশগুলি বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন, পারমাণবিক প্রযুক্তি, বিভিন্ন রকমের বৈদেশিক সাহায্য প্রভৃতি কৌশলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক প্রভাব খাটাচ্ছে। উন্নত আধিপত্যশীল উত্তরের দেশগুলোর এই ধরনের কার্যকলাপে কেন্দ্রীয় দেশগুলির সাথে প্রান্তীয় এবং আধা প্রান্তবর্তী দেশগুলোর দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে। একসময় লেনিনের যে মন্তব্য ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর্থিক পুঁজির শক্তি এতটাই শক্তিশালী হবে যে তা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রকেউ ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলির অধীনস্থ করে রাখবে। যা আজকের একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণের দেশগুলোর ক্ষেত্রে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। আজও দেখছি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশগুলির সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রকৃতি সবদিক থেকে যতটা আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন তার থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথায় কথায় কাটসা আইন লাগানোর প্রচেষ্টা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর স্বাধীন নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে যথেষ্টই উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি ভারতের রাশিয়ার কাছ থেকে S-400 ক্ষেপনাস্ত্র ক্রয় এর উপর আমেরিকার CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) লাগানোর ভয় ভারতের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই লক্ষ্য করা গেছে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মত দেশগুলি উন্নত শক্তি ও সংস্থাকে কাজে লাগিয়েছে এবং নতুন নতুন পদ্ধতি ও যন্ত্রের ব্যবহার করে এসেছে দক্ষিণের দেশগুলিকে শোষণ ও সম্পদ লুঠ করার জন্য। ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন যথার্থই তার বিশ্বব্যবস্থার আলোচনায় দেখিয়েছেন যে উদ্বৃত্ত মূল্য কেন্দ্রীয় অঞ্চলে শ্রমিক থেকে মালিক এবং প্রান্তবর্তী এলাকায় মালিক থেকে কেন্দ্রীয় এলাকায় মালিকের হাতে হস্তান্তরিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে পুতুল সরকার গঠন আমেরিকার এক উল্লেখযোগ্য কৌশল। ২০০০ সালে আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে পুতুল সরকার স্থাপন করে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে আমেরিকা তার আধিপত্য ধরে রেখেছিল। এবং ২০২১ সালে সেই তালিবান নামক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে আমেরিকা সেনা প্রত্যাহার করে এই বিষয়টি আসলে নয়া-উপনিবেশবাদের কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতের উপরেও সামরিক অস্ত্র ক্রয়ের ব্যাপারে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি আমেরিকার আধিপত্যকারী নীতির প্রতিফলন। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স এর বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে দক্ষিণের দেশগুলো থেকে অতিসুলভ মূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করছে এবং সেই কাঁচামাল থেকেই শিল্প পণ্য রপ্তানি করে কোটি কোটি মার্কিন ডলার মুনাফা অর্জন করছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি, ভারতের বাজারে আলুর দাম সারা বছরে প্রায় কুড়ি টাকা কেজি এর মধ্যেই থাকে এই আলু কুড়ি টাকায় ক্রয় করে চিপস্ বানিয়ে, ২০ গ্রাম পিছু দশ

টাকা করে প্যাকেট করে ভারতের বাজারে বিক্রয় করে বহুজাতিক সংস্থা। এটা থেকেই পরিষ্কার লাভের মাত্রা কি বিশাল একইরকমভাবে টমেটো থেকে টমেটো সস্ এবং নানা বোতলজাত পানিয়ের ক্ষেত্রেও এই লাভের লক্ষ্যমাত্রা ভীষণভাবে প্রকট। সুতরাং সময় এসেছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর আত্মনির্ভরশীল হওয়ার এবং নয়া উপনিবেশবাদী শোষনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার।

ভোগ্যপণ্যজাত দ্রব্যাদির চাহিদা সৃষ্টি দক্ষিণের দেশগুলির উপর: বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ, বিশ্বব্যাপী বাজার উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থের চলাচল, তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ আদান-প্রদানের পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয়েছে। সাথে সাথে আধিপত্যকারী উত্তরের দেশগুলোর আধিপত্য অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল রাষ্ট্র গুলির আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রচেষ্টার উপর এক বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জনগনের মনে চাহিদার এক বিরাট সম্ভার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সেই চাহিদা পূরন করার মত উপযুক্ত পরিকাঠামোর দক্ষিণ এশিয়ায় দেশগুলিতে গড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। যার পরিনাম স্বরূপ লক্ষ্য করা যায় এক সুদুরপ্রসারী শোষণের এবং ইউরোপ-আমেরিকার আধিপত্যশীল দেশগুলির বহুজাতিক সংস্থা গুলির ভবিষ্যৎ ব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনা। বিশ্বায়নের দৌলতে দক্ষিণের দেশগুলোতে ইন্টারনেটের ব্যবহার মাত্রাহীন ভাবে বেড়েছে। ভারতের মতো দেশে আজ একজন মাঠে গরু চরানো রাখালের হাতেও স্মার্টফোন লক্ষ্য করা যায়। এই যে বিপুল তথ্য প্রযুক্তির চাহিদা ভারতের মানুষের মনে সৃষ্টি করা হয়েছে এর পিছনে বিশ্বায়নের এক বিশাল অবদান রয়েছে এই চাহিদা সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। আসলে ভারত হলো জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার বহুল দেশ। এই বিশাল বাজারে একবার কোন বস্তুর চাহিদা সৃষ্টি করতে পারলেই বিপুল লাভের সম্ভবনা রয়েছে। তাই ইউরোপের এবং আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থাগুলির মূল লক্ষ্য হলো ভারতের বাজারকে উন্মুক্ত রাখা এবং ভারতের মানুষের মনে নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি করা। একবার কোন পণ্যের প্রতি চাহিদার সৃষ্টি হলে সেই চাহিদা রাষ্ট্রের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে ঠিক পৌঁছে দেওয়া যাবে জনগনের নাগালে। তাই দেখা যায় দক্ষিণের প্রত্যন্ত এলাকা গুলিতে যেখানে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, ঠিকভাবে শিক্ষার আলো পৌছায়নি সেখানেও পৌঁছে গেছে কোকাকোলা, পেপসি, লেস, ম্যাগি, পাস্তা প্রভৃতি প্যাকেটজাত খাবার। এই সমস্ত মুখরোচক খাবারের দ্বারা দক্ষিণের জনগণের মধ্যে একদিকে ওবেসিটি বাড়ছে অন্যদিকে সুগার, প্রেসার, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের প্রকোপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মতো দেশগুলোতে স্থায়ী উন্নয়নের উপর বুলেট চালিয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে 5 G-র মত পরিষেবা চালু করতে। অতিরিক্ত প্রযুক্তির চাপে অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ ঘটছে দক্ষিণের দেশগুলোতে, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

নতুন কৌশলে সরকারের উপর প্রভাব বৃদ্ধি: আধিপত্যশীল বিভিন্ন উত্তরের দেশগুলি দক্ষিণের দেশগুলোর উপর আধিপত্য স্থাপনের ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে, দৃষ্টি রেখেছে সরকার গঠনের উপরও। নির্বাচনে অনেক সময়ই লক্ষ্য করা যায় তাবেদার সরকার গঠনের জন্য পরোক্ষভাবে বিপুল অর্থ ব্যয় করে আধিপত্যশীল উত্তরের দেশগুলি। এছাড়া লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত এবং আর্থিক তছরুপে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অনেক সময়ই নিজের দেশে অপরাধ ও আর্থিক দূর্নীতি করে পাড়ি দেয় ইউরোপ, আমেরিকার মত আধিপত্যশীল দেশে। ভারতের বিজয় মালিয়া এবং নীরব মোদির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজন ব্যক্তি বর্তমানে ভারতের কোটি কোটি টাকা কেলেঙ্কারিতে যুক্ত। উন্নত দেশগুলি নামমাত্র বিচারের নামে এদের আশ্রয় দেয় এবং পরোক্ষে এদের

আশ্রয়দাতা হিসেবে কাজ করে। আসলে এই সমস্ত অপরাধীদের কাছে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ ধনসম্পত্তি নিজেদের দেশে গচ্ছিত রাখা হল উন্নত আধিপত্যশীল দেশগুলোর মূল লক্ষ্য। অপরাধীদের এরকম আশ্রয়দানে দক্ষিণের দেশগুলোতে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকারের উপর নানারকম চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক সময় পুতুল সরকার গঠনের প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণের দেশগুলোত। ২০০৪ সালে আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে তালিবান সরকারের উচ্ছেদ করে 'ইসলামিক রিপাবলিক অফ আফগানিস্তান' গঠন করে আমেরিকা। আসলে এই সরকার ছিল আমেরিকার তাবেদারি করা এক সরকার, একইরকমভাবে একটা সময় পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্যের বিনিময়ে পাকিস্তান সরকারের উপর অন্য দেশ থেকে অস্ত্র কেনার উপর আমেরিকা নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণের দেশগুলোর উপর এক ধরনের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা মার্কিন এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে প্রায়শই লক্ষ করা যায়।

উত্তরের দেশগুলির উপর নির্ভরশীলতার একমুখী কাঠামো: প্রাক্ স্বাধীনতার পর্যায় থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য স্থাপনকারী দেশগুলি দক্ষিণের দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর আধিপত্য স্থাপন করে এসেছে। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়কাল থেকেই ব্রিটিশরা ভারতের সমাজ বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্র গুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পর্যায়েও লক্ষ্য করা গেছে এই আধিপত্যের মাত্রা কমেনি। ভারতসহ দক্ষিণের অন্যান্য দেশগুলোর উপর এই যে আধিপত্য স্থাপন এর মাত্রা তা বরাবরই একমুখী। দক্ষিণের দেশগুলোর সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকা যে নির্ভরশীলতা তৈরি করেছে সেখানে দেখা যায় দক্ষিণের দেশগুলোর উপর আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলো যতটা নির্ভরশীল তার থেকে অনেক বেশি নির্ভরশীল দক্ষিণের দেশগুলো উক্ত উত্তরের দেশগুলোর উপর। এই একমুখী নির্ভরশীলতা স্বাধীনতার ৭৪ বছর পরেও ভারতের মত একটা বিশাল জনবহুল দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালি হয়েও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আজও আমাদের অস্ত্র আমদানি এবং প্রযুক্তির জন্য ফ্রান্স, আমেরিকার মত দেশের উপর অনেকটা নির্ভরশীল হতে হয়। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারতের অগ্রগতি যতটা পরিমাণে হওয়ার কথা ঠিক ততটা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কারণ সামরিক ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা। ভারতের মেধাবী যুবসমাজ আজ বিশ্ববন্দিত। আমরা দেখেছি গুগল, মাইক্রোসফট, টুইটার প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার বিভিন্ন উচ্চপদস্থ পদে কর্মরত রয়েছে অসংখ্য ভারতীয়। কিন্তু ভারত আজও কোন নিজস্ব ভালো ইন্টারনেট সার্চিং ইঞ্জিন ভারতবাসীকে উপহার দিতে পারেনি। উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব এর জন্য ভারতে তৈরি হওয়া অসাধারণ সব ছাত্র-ছাত্রীরা আমেরিকা, ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পাড়ি জমাচ্ছে। ফলত এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিপুল পরিমাণ ব্যয় সরকারের কোন কাজে আসছে না এবং দেশকে প্রযুক্তির ব্যাপারে সেই আধিপত্যশীল উত্তরের দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের কোষাগারের এক বিরাট অংশ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে বিদেশ থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তি এবং ওষুধপত্রের কাঁচামাল আমদানি করতে। ভারতে উপযুক্ত প্যাকেজিং এর অভাব, উপযুক্ত সংগ্রহশালার অভাব এর জন্য প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রিসাইক্লিং এর জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে **ই-বর্জ্য** সৃষ্টি জমা হচ্ছে ভারতে। এইভাবে দেখা যায় বিভিন্ন দিক থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার আধিপত্যকারী উন্নত রাষ্ট্রগুলো এমন একটা 'হেজিমোনিক সাইকেল' রচনা করেছে যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে তাদের উপর একমুখী নির্ভরশীল হওয়ার জন্য বাধ্য করেছে।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে উত্তরের মডেল এর অনুকরণ: দক্ষিণের প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষের জীবনধারা, পছন্দ, শারীরিক গঠন প্রভৃতি ইউরোপ-আমেরিকার উত্তরভুক্ত দেশগুলোর তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন ধরনের। এরকম ভিন্নধারা হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণের বেশিরভাগ উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলিতে দেখা যায় ইউরোপীয় ও আমেরিকার মডেল অনুকরণ। এইরকম উন্নয়ন মডেল গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশগুলির ইউরোপ ও আমেরিকার উপর নির্ভরশীলতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যতদিন না এই ঔপনিবেশিক মডেলের অনুকরণ কমানো যাবে ততদিন দক্ষিণের দেশগুলোতে আধিপত্যবাদের অবসান ঘটানো যাবে না। ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আজ ইউরোপীয় এবং আমেরিকান বিভিন্ন মডেলের অনুকরণ সুস্পষ্ট যার নেতিবাচক প্রভাবও সুস্পষ্ট। ভারতে মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে আবেগ, ভালোবাসা, ন্যায়বোধ প্রভৃতি মানবিক গুণগুলো হ্রাস পাচ্ছে। মানুষ স্বার্থপর হয়ে উঠছে, নৈতিকতার অবক্ষয় হচ্ছে। ভারতের মত দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোর বন্টন ঠিকঠাক না হওয়ার জন্য এবং শ্রমবন্টন ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রমিকের কাজের মজুরির মধ্যে ভারসাম্য ঠিকঠাক না হওয়ার জন্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভারতে একশ্রেণীর মানুষ খুব বড়লোক হয়ে পড়ছে আবার আরেক শ্রেণীর মানুষ দিন দিন আরো দরীদ্র হয়ে যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অনলাইন মার্কেটিং এর প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ছোট ছোট ব্যবসাদারদের জীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে এক সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে এই সংকটের জন্য ইউরোপীয় মডেলের অনুকরণ অনেকাংশেই দায়ী। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে বেশিরভাগ বেসরকারি পাঠ্যক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সমস্ত ক্ষেত্রে আধিপত্যবাদ গড়ে ওঠার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি শুধুমাত্র দায়ী এ ধারনা ঠিক নয়। দক্ষিণ এশিয়ার নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে এই রকম ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অনেকাংশেই দায়ী। অতিমাত্রায় উন্নত দেশগুলোর অনুকরণ দক্ষিণের দেশগুলোর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

দক্ষিণের দেশগুলির মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা: উন্নয়নের হারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা দক্ষিণের দেশগুলিকে ইউরোপের অন্য দেশগুলোর কাছে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য বাধ্য করেছে। যেকোনো প্রাকৃতিক বড় ধরনের বিপর্যয়ে দেখা যায় ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, আফগানিস্তানসহ দক্ষিণভুক্ত দেশগুলি সহজেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউতে ভারতের মতো দেশগুলোতে লক্ষ্য করা গেছে মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ঘাটতি। অত্যধিক জনসংখ্যার কারণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারনে এবং মানুষের অসচেতন মনোভাব বারবার মহামারীকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছে। জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ এর সাথে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা দক্ষিণের দেশগুলিকে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় উন্নত দেশগুলির কাছে বারবার হাত পাততে বাধ্য করেছে। অথচ দক্ষিণের বেশিরভাগ দেশই এই মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার ব্যাপারে উদাসীন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থাও গৃহীত হয়নি দক্ষিণ এশিয়ার বেশীরভাগ দেশেই।

দক্ষিণের দেশগুলির উপর চীনের প্রভাববৃদ্ধি: এশিয়ার নতুন শক্তি হিসেবে চীনের উত্থান দক্ষিণের দেশগুলোর উপর এক নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এতদিন দক্ষিণের দেশগুলোর বাজারের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ ছিল। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে এই নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই আমেরিকাসহ ইউরোপীয় দেশগুলোর হাতছাড়া হয়। অপেক্ষাকৃত কমদামে এবং কম সময়ে

চীনা পণ্য দক্ষিনের দেশগুলোর বাজার গুলিতে প্রবেশ করতে থাকে যার ফলে আমেরিকাসহ ইউরোপের আধিপত্যকারী দেশগুলির বহুজাতিক সংস্থাগুলি ব্যাপকভাবে ধাক্কা খায়। চীন হয়ে ওঠে এশিয়ার এমন এক শক্তি যাকে আটকানোই এখন মূলত উত্তরের দেশগুলির সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। চীনও সম্প্রতি নেপাল, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ দক্ষিণের বেশিরভাগ দেশে বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষিণের দেশগুলোর উপর নানান ভাবে আধিপত্য স্থাপন করতে শুরু করে। শোনা যায় আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা অপসারণের জন্য চীন আফগানিস্তানকে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন রকমের সাহায্য করেছে। আমেরিকাও চীনকে আটকানোর জন্য বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করে চলেছে। বিশেষত দক্ষিণ এশিয়া সহ গোটা বিশ্বে চীনের প্রতিপত্তি কম করার জন্য আমেরিকা QUAD/ QSD (Quadrilateral Security Dialogue) গঠন করেছে এর অন্তর্ভুক্ত চারটি দেশ হল আমেরিকা ,ভারত, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণের দেশগুলিতে আমেরিকার প্রভাব অক্ষু্ন রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত তার প্রমাণ আমরা আরো পেয়ে থাকি, সাধারণত রাশিয়া থেকে অস্ত্র আমদানিকারী দেশের উপর আমেরিকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাটসা আইন লাগু করা থেকে। কিন্তু ভারত, রাশিয়া থেকে S-400 নামক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় করা সত্ত্বেও আমেরিকা এই আইন ভারতের উপর প্রয়োগ করেনি। যুক্তি হিসেবে যেটা উঠে আসে তা হল আমেরিকার এখন প্রধান প্রতিদ্বন্দী হল চীন এবং ভারতের এই অস্ত্র আমদানি যেহেতু চীনের বিরুদ্ধে তাই ভারতকে সাপোর্ট করাই আমেরিকার মূল লক্ষ্য। এর পিছনেও আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখার একটা প্রচ্ছন্ন মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

জাতিপুঞ্জের একপেশে মনোভাব: সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর যে লক্ষ্য নিয়ে গঠন করা হয়েছিল তা আদৌ আজ অনুসরণ করা হচ্ছে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আজ একটি তাবেদারী সংস্থায় পরিণত হয়েছে। ২০২০ ইসরায়েল-প্যালেস্তাইন সংকটে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদর্থক ভূমিকা পালন না করা, আফগানিস্থানে তালিবানের পুনরুত্থানে নীরব থাকা,এবং সম্প্রতি ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধেও জাতিপুঞ্জের নীরব ভূমিকা প্রভৃতি ঘটনা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর মানুষের আস্থা অনেকখানি কমিয়েছে। দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক কাঠামোতে ১৯৪৫ সালে আর ২০২২ সালের মধ্যে বিস্তর পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু আজও ১৯৪৫ সালের পর থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মুখ্য সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রকাঠামোতে কোন পরিবর্তন আসেনি। আজকে বিশ্বে নতুন নতুন অনেক শক্তির উত্থান ঘটেছে, অনেক নতুন দেশ আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু করেছে, এক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এবং ওমিক্রন পর্বে আন্তর্জাতিক বিশ্বে দক্ষিণের দেশ হিসেবে ভারতের অবদান অবিস্মরণীয়। এমনকি আমেরিকার মতো দেশকেও করোনার প্রথম পর্বে ভারত হাইড্রক্সিক্লুরোকুইন নামক ওষুধ সরবরাহ করেছে। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপকে করোনা মহামারী প্রতিরোধে ভারত ওষুধপত্র, মাস্ক, স্যানিটাইজার থেকে শুরু করে ভ্যাকসিন পর্যন্ত সাহায্য করেছে। তালিবানের উত্থানের পর থেকেই আফগানিস্থানে খাদ্য সংকট অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে ভারত অতিমারি পর্বে আফগানিস্তানে খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়েছে। আজকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার রক্ষা, বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধ, মহাকাশ গবেষণায় সহযোগিতাসহ সমস্ত কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে ভারতের। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও বিশ্বের কিছু মুষ্টিমেয় আধিপত্যকারী দেশের অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য ভারতকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্থায়ী সদস্যপদ থেকে আজও বঞ্চিত করা হয়েছে। আজকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক দেশ হল ভারত। বিশ্বে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতের অবদান অবিস্মরণীয় কিন্তু তা সত্বেও সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের স্থিতিশীল ভূমিকা এবং আধিপত্যকারী উত্তরের দেশগুলির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ভারতকে তার নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত করেছে যা কখনোই কাম্য নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল উদ্দেশ্য হল এই কর্মকান্ডের পিছনে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ উত্তরের দেশগুলোর আধিপত্য ধরে রাখা।

আফগানিস্তানে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা ও তার অবসান: আফগানিস্থানে তালিবান এর প্রতিষ্ঠা হওয়ার পিছনে আমেরিকার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ার সেনাকে সরানোর জন্য আফগানিস্তানের বিভিন্ন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে আমেরিকার অস্ত্রপ্রদান যে তালিবান নামক সন্ত্রাসবাদি সংগঠন গড়ে ওঠার পেছনে যথেষ্ট অবদান যুগিয়েছে তা নিয়ে দ্বিমত পোষণের কোনো অবকাশ নেই। ২০০৪ সালে আফগানিস্তানে যে পুতুল সরকার গঠন করে আমেরিকা তার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণের দেশগুলোতে আমেরিকার আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখা। সন্ত্রাসবাদ দমনই যদি মূল লক্ষ্য হত তাহলে আমেরিকার হঠাৎ করে সেনা সরিয়ে আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণকে সন্ত্রাসবাদি শাসনের হাতে তুলে দেওয়া লক্ষ্য হত না। আসলে আফগানিস্তানের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখাই ছিল তৎকালীন ওবামা প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। পরবর্তীকালে ২০২১ সালে আমেরিকা উপলব্ধি করে আফগানিস্তান থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে দক্ষিণের দেশগুলোতে সন্ত্রাসবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং আমেরিকা তার অস্ত্রশস্ত্রের বাজারকে আবার চাঙ্গা করতে পারবে। দক্ষিণের দেশগুলোতে যতদিন অস্থিরতা থাকবে আমেরিকার মতো দেশের কাছে তা মঙ্গল জনক হবে একথা নতুন করে বলার অবকাশ রাখে না। আসলে আমেরিকা কখনোই মনেপ্রাণে চাই না যে ভারত-পাকিস্তান বন্ধু হয়ে উঠুক, চীন-ভারত সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ সহযোগিতামূলক হোক। আসলে আমেরিকাসহ ইউরোপিয়ান আধিপত্যকারী রাষ্ট্রগুলি এমন এক 'Hegemonic Cycle' রচনা করেছে যা দক্ষিণের দেশগুলোর সময়ের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার ৭৪ বছর পরেও শোষণের একই জায়গায় রেখে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় উত্তরের কর্তৃত্ব: দক্ষিণ এশিয়ার যে আধিপত্যের বেড়াজাল রচনা করা হয়েছে তার পিছনে এক আন্তর্জাতিক মিডিয়া ভীষণ সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। আসলে দক্ষিণের দেশগুলোতে ইন্টারনেটে যে সব সহযোগী মাধ্যমগুলি রয়েছে যেমন গুগল, টুইটার, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, লিঙ্কডইন এবং ইউটিউব তার বেশির ভাগই মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন এই সমস্ত সোশ্যাল সাইট গুলো থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলী আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতের মুঠোয় তাই এই সমস্ত সাইটের মাধ্যমে নাগরিকদের সাধারণ জীবনে প্রবেশ করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন কালচার ভালো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বৃহৎ, সন্ত্রাসবাদ দমন করলে শান্তি আসবে এই ধরনের নানা খবরাখবর প্রচারের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আধিপত্যবাদের বিস্তার ঘটায়। আসলে এই সমস্ত সোশ্যাল সাইট এর মাধ্যমে মুনাফা লাভই যে আমেরিকার মূল লক্ষ্য তা গোপন থেকে যায় তাই আজ গুগল, ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ প্রভৃতি বহুজাতিক সংস্থা গুলি বিশ্বের এক উল্লেখযোগ্য সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

কোভিড-১৯ ও ওমিক্রন পর্বে উত্তরের প্রভাববৃদ্ধির প্রচেষ্টা: কোভিড-১৯ ও ওমিক্রন পর্বেও লক্ষ্য করা গেছে ব্রিটেনসহ ইউরোপের দেশগুলির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত। ভারতীয় ভ্যাকসিন যাতে বিশ্বে প্রভাব ফেলতে না পারে তাই ব্রিটেন ভারত থেকে ব্রিটেনে আগত ভারতীয়দের ভ্যাকসিন কে অবৈধ ঘোষণা করে। যদিও পরবর্তীকালে ব্রিটেন তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এই প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায় এই সমস্ত

উন্নত দেশের সরকারের দক্ষিণের দেশগুলোর প্রতি কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ভারতের ভ্যাকসিন যাতে বিশ্বের অন্যত্র প্রভাব ফেলতে না পারে এবং ভারতের ঔষধপত্র যাতে বিশ্বের কোন দেশে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে তার জন্য আমেরিকা ও ব্রিটেনের যৌথ প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা গেছে। যদিও এই ধরনের মনোভাব আজকের সুস্থ সভ্য সমাজ গঠনের পথে এক বিরাট বড় বাধা।

মন্তব্য: করোনা মহামারী পর্বে লক্ষ্য করা গেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ কার্যত থমকে গিয়েছে। এই পর্যায়ে লক্ষ্য করা গেছে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ থাকার জন্য আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলির অর্থনীতি কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও তলানীতে নেমে গেছে। আসলে উন্নত এই সমস্ত দেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বের অনুন্নত দক্ষিণের দেশগুলোর অনুন্নয়নের উপর। এই সমস্ত দক্ষিণের অনুন্নত দেশ গুলি যেদিন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে উত্তরের আধিপত্যকারী দেশগুলির নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে সেদিনই উন্নত দেশগুলির কঙ্কালসার চেহারা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকট হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র:

১। Rumki, Basu, (2014). Concepts Theories and Issues, Sage Texts, p. 56.
২। J. Baylis, S. Smith, and P. Owens, (2014). The Globalization of World Politics, Oxford University Press, pp. 35-45.
৩। বসু, গৌতম, (২০০৬). আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব ও বিবর্তন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৫৭।
৪। চ্যাটার্জী, অনীক, (২০১০). ঠান্ডাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃপৃ. ৫৭-৬৭.
৫। A.G. Frank, (1967). Capitalism and Underdevelopment, New York: Monthly Review Press, p. 85.
৬। F.H. Cardoso and Feletto, (1979). Dependency and Development Latin America, Berkeley; University of California Press, p. 87.
৭। Immanuel, Wallerstein, (1979). The Capitalist World Economy, Cambridge University Press, p. 69.
৮। Galtung, John, (1971). A Structural Theory of Imperialism, Journal of Peace Research, No -2, pp. 81-86.
৯। Chilcott, H. Robert, (1984). Theories of Development and Underdevelopment, Western Press, p. 87.
১০। Amin, Samir, (1976). Unequal Development, New York: Monthly Review Press, p. 69.
১১। Lenin, V.I., (1971). Imperialism: The Highest Stage of Capitalism, Selected Works: Moscow, p. 46.
১২। Rostow, W.W. (1966). The Stages of Economic Growth, Cambridge University Press, p. 92.